দ্রষ্টার দর্শনে

- বিপুল সাহা

১। ভূমিকা

একমাত্র মানুষই সফল দ্রষ্টা। সাফল্যের সঙ্গে দর্শন করতে স(ম। দর্শন মানে শুধু চা(ষ দর্শন নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় চ(-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের সাহায্যে সামগ্রিক উপলব্ধির কথা বলা হচ্ছে। এমন কি অন্তিমে মনের দ্বারা যে চিন্তাভাবনা হয় তার কথাও । এ সবই দেখা বা দর্শন – অবজার্ভেশন।

দ্রষ্টব্য বিষয় বহির্জগত তথা বি(েজগত এবং কিছু পরিমাণে দ্রষ্টার আপন অন্তর্জগত। বহির্জগত দর্শনের পরিমাণ প্রকৃতি এবং গভীরতার উপর নির্ভর করে দ্রষ্টার অন্তর্লোকের নির্মাণ হয়। তারই ফলশ্রুতি অন্তর্দর্শন। সুতরাং অন্তর্লোক প্রাথমিকভাবে দ্রষ্টার বহির্জগত-দর্শনের উপর নির্ভরশীল।

লৌকিক জ্ঞানানুসারে বহির্জগত স্বতন্ত্র এবং দ্রষ্টানিরপে(। তার স্বরূপ দ্রষ্টার উপর নির্ভরশীল নয়। আপাতদৃষ্টিতে দ্রষ্টব্য বস্তু এবং দ্রষ্টার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমান। বহির্জগতের দ্রষ্টব্য বস্তুর গুণাগুণ কখনোই দ্রষ্টার উপর নির্ভর করে না। করে আপন গঠনের উপরে – নিজস্ব রসায়নে, ভৌত অবস্থানের স্বকীয়তায়। ন(ত্রের বৈশিষ্ট্য আমাদের উপর নির্ভর করে না। হিমালয়ের উচ্চতা দ্রষ্টা থাকলেও যা থাকবে, না থাকলেও তাই থাকবে। এটাই সাধারণভাবে আমাদের সকলের জানা। এতকাল ধরে। এবং তা ভুলও নয়। সম্প্রতি তা নিয়ে প্র(উঠেছে। যা দেখছি তা যেন ঠিক নয়। বহির্জগতও যেন বহুল পরিমাণে দ্রষ্টা-নির্ভর! এবং তা কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রে নয়, বাস্তববাদী বস্তুবাদী ও যুক্তি(বাদী বিজ্ঞানেও! এ সংবাদ চমকে দেওয়ার মতোই।

এমন কি হতে পারে যে দ্রষ্টা যেমন করে দেখতে চায় জগতের বাস্তবতা তেমন করে প্রকাশিত হয়? যেন জগতের বাস্তবতা অপে(া করছে দ্রষ্টার চোখের চাহনির উপর। তা কি সম্ভব? হস্তী কি প্রকার তা কি দ্রষ্টার উপর নির্ভর করে আছে? দ্রষ্টা যদি তাকে শুকরের মতো দেখতে চায় তবে তা কি শূকরের মতো দর্শনীয় হবে? যদি হস্তীর মতো দেখতে চায় তবেই কি তা হস্তী-সদৃশ হবে?

ব্যবহারিক জীবনে আমরা দর্শন নিয়ে এমন গভীর সমস্যায় পড়ি না। যা দেখি তার প্রকৃত স্বরূপই দেখি। হস্তীকে হস্তীস্বরূপই দেখি। চাঁদকে চাঁদই দেখি। আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখি, না তাকালেও চাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হই না। পায়সান্নকে চপ-কাটলেট মনে করি না বা চপ-কাটলেটকে পায়সান্ন। গাড়ি চড়তে বসলে তাকে মিথ্যা মায়া বলি না। গাড়ি খারাপ হলে তার কলকব্জা সারাই করতে সমস্যা হয় না।

২। দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণে

দার্শনিক সম্প্রদায়ের গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তাই তাঁরা আমাদের নিকট জ্ঞানী হিসেবে শ্রদ্ধেয়। তাঁরাই জগতস্বরূপ প্রকৃত দর্শন করতে ও করাতে স(ম। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা তাঁরাই যথাযথ রূপে বুঝতে পারেন বা বুঝতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কখনো কখনো দার্শনিকদের চিন্তাধারা ব্যবহারিক ধারণার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। তখন তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে সঙ্কট দেখা দেয়।

আমরা অবহিত যে দর্শনের দুটি প্রধান ধারা। বস্তুবাদী ধারণায় বি(েজগত আকণ্ঠ বস্তুময়। জড়বস্তু দ্বারা নির্মিত বি(েজগতই আদি এবং প্রধান, সুতরাং দ্রষ্টানির্ভর নয়। ভাববাদী জগত তার অনুবর্তী। ভাববাদী ধারণায় জগতে ভাবসত্তাই প্রধান, সুতরাং দ্রষ্টানির্ভর। ঈ(ের জগতের স্রষ্টা এবং অনন্ত ভাবসত্তাময়। তাঁরই ইচ্ছায় বস্তুজগতের নির্মাণ এবং প্রকাশ। মানুষ ঈ(েরের প্রতিচ্ছবি।

বস্তুবাদী কিংবা ভাববাদী দর্শনেরও নানা প্রকারভেদ আছে। ভাববাদী দর্শনের এক চূড়ান্ত প্রকাশে বস্তুজগতকে ভাবসত্তার নির্মাণ এবং এক অবাস্তব এবং অলীক কল্পনা বলে মনে করা হয়। ১৮শ শতকে আইরিশ দার্শনিক বিশপ বার্কলে হাজির করেছেন অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব। তাঁর মতে যে কোন অস্তিত্ব আসলে প্রত্য(-নির্ভর। জড়দ্রব্যকে প্রত্য(করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যকে স্বীকার করা চলে না। আমরা জড়দ্রব্য জানি - একথার অর্থ তার গুণসকল জানি। গুণের অতিরিক্ত(আর কিছু জানতে পারিনা। কাজেই আমাদের কাছে জড়দ্রব্যের কিছু গুণের অস্তিত্ব আছে মাত্র।

অথচ গুণসকল প্রকৃতপ(মনের ধারণা। তাহলে জগতে মন এবং মনের ধারণা ব্যতীত আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। আবার তিনি বলেন যে অমূর্ত ধারণা (অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া)বলেও কিছু হয় না। মানুষ বললে আমাদের মনে অজান্তে একজন মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

ভারতীয় দর্শনে সমগোত্রীয় ভাবনা ল(্য করা যায় কেবলাদ্বৈতবাদে। অষ্টম শতকের শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জগত মিথ্যা। ব্রহ্ম মায়াশক্তি(র প্রভাবে জগতরূপে প্রকাশিত। মায়া জগত প্রপঞ্চ সৃষ্টির শক্তি(রূপে ব্রহ্মে বিদ্যমান। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগত সত্য বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র আসলে তা সত্য নয়। জগত মিথ্যা মায়া। আমরা ব্রহ্মকে জগতস্রষ্টা বলে গণ্য করি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনি জগতের মতো মিথ্যা নন বা জড় নন। বরঞ্চ একমাত্র তিনিই সত্য।

বিশপ বার্কলে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করা যায় না, এমনটাই মনে করতেন। শঙ্করাচার্য সমগ্র জগতকেই মিথ্যা প্রপঞ্চ মনে করছেন। দ্রষ্টব্য জগত বলেই কিছু নেই। সমস্যা হল – জগতের প্রকৃত স্বরূপ যতদূর যেভাবে জানা যায় তার সাহায্যে আমরা সভ্যতা গড়েছি, আকাশে মহাকাশে বিচরণ করছি, মুহূর্তের মধ্যে দূরসংযোগ সাধন করতে পারছি। প্রকৃত গুণাগুণ জানা না থাকলে তা কি সম্ভব হত? কিংবা জগত মিথ্যা প্রপঞ্চ-মায়া হলে সম্ভব হত? আদপেই হত না। দৈনন্দিনের কাজকর্মে ব্যবহারিক জীবনে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত।

দুর্জনবাক্য অনুসারে দর্শনশাস্ত্র যদি নিছক কথার মারপ্যাঁচও হয় তবে না হয় খানিকটা উপে(া করা গেল। কিন্তু আকণ্ঠ যুক্তি(বাদী বলে মান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রকে উপে(া করা তো সহজ নয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে এমন ধারণা তো কোনকালেই ছিল না। এখন সেখানেও জটিলতা দেখা দিচ্ছে।

৩। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোনে

বিজ্ঞান জ্ঞানান্বেষণের এক বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে। সেই পদ্ধতি হল - নিরী(া ও তথ্য সংগ্রহ, প্রকল্প নির্মাণ, পরী(া ও বি(-ষণ এবং তত্ত্ব নির্মাণ। প্রয়োজনে সমগ্র পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হয়, যত(ণ না সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়। বিজ্ঞানের কাজকর্ম বস্তু নিয়ে, বস্তুজগত তথা বাহ্যজগত নিয়ে। মানুষ্যদেহ বস্তুনির্মিত এবং জ্ঞাতব্য। মানুষের মন একই পদ্ধতির অনুসরণ সাপে(বিজ্ঞানের বিষয়।

জ্ঞান বস্তুনির্ভর হলেও জ্ঞাতার মাধ্যমে সংগৃহীত জ্ঞানে অবস্তুর ভূমিকা অনুভব করা যায়। জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য একদিকে জ্ঞাতব্য জগত (প্রধানত বাহ্যজগত) অন্যদিকে মগজ-ইন্দ্রিয়-স্নায়ুতন্ত্র ও তা দ্বারা নির্মিত ও বোধ্য ভাষা, ভাষার সাহায্যে গঠিত স্মৃতি-বুদ্ধি-যুক্তি(, এককথায় মগজ-নির্ভর ভাবনাচিন্তা। বাহ্য বস্তুজগত কিভাবে ভাবনাচিন্তায় মূর্ত হল আমরা তা সোজাসুজি প্রত্য(করতে পারি না। আমরা নিজে ভাবনা করতে পারি, এবং অন্যদের নিকট তার বাহ্য প্রকাশ প্রত্য(করতে পারি - অঙ্গভঙ্গীতে, কথায় এবং লেখায়। তাহলে বস্তুর অতীত অবস্তু বা ভাব নামক এক বাস্তব ব্যাপার আছে। তা মানুষের মগজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত(, তা জানার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত(অন্তর্জগত। এখানেই দ্রষ্টার বিশেষ ভূমিকার অবতারণা সম্ভব বলে অনুভব করা যায়।

(ক) বাহ্য স্থূল জগত

স্থূল বাহ্যজগতের অস্তিত্ব দ্রষ্টা নিরপে(। নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দিষ্ট বস্তুগত তথা বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা। যেমন বস্তুর গতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং পরে আইজাক নিউটন প্রবর্তিত গতিবিদ্যার দ্বারা। বস্তু সেখানে হয় ভর-বিশিষ্ট কণার সমাহার অথবা শক্তি(-তরঙ্গের জমাট-বাঁধা প্রয়াস। অতএব জগত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যেভাবে তা এই প্রকার ক্লাসিকাল বলবিদ্যায় ধরা পড়ে। খৃষ্টপূর্ব সময়ের গ্রীক ভাবধারার স্বর্ণযুগ থেকে, মধ্যযুগে ষোড়শ শতকে পুনরাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সময় থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এমনটাই চলে এসেছে।

(খ) বাহ্য সূক্ষ্ম জগত

এতকাল সমস্ত বাহ্য বস্তুজগতই বিজ্ঞনের আলোয় স্বতন্ত্র ও দ্রষ্টানিরপে(বলে জেনে এসেছি। আদুনিক বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তত্ত্বে সূক্ষ্ম বস্তুকণার (ে ত্রে তার ব্যত্যয় ল(্য করি। ফলে বিংশ শতকে অবস্থানটা ভীষণভাবে বদলে গেল। বস্তুর আরো সূক্ষ্মরূপ আবিষ্কারের পরে দেখা গেল যে ঐ সূক্ষ্ম বস্তুকণা পরিমাপের (ে ত্রে নিউটনীয় ক্লাসিকাল বলবিদ্যা পুরোপুরি কাজে আসছে না। তা আরো নিখুঁতভাবে

পরিমাপ করা যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দ্বারা। সূক্ষ্ম বস্তুকণা বলতে বোঝানো হয় ইলেকট্রন কণা বা আলোর কণিকা (ফোটন) জাতীয় কণা।

নিউটন পরী(া করে বলেছিলেন – আলোক হল কণার স্রোত। আলোর অন্য কিছু আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে তা তরঙ্গধর্মী। ১৮০১ সালে টমাস ইয়ং 'টু স্লিট এক্সপেরিমেন্ট' করে দেখালেন – আলো একবার সন্দেহাতীতরূপে তরঙ্গপ্রবাহের মতো, যদিও আরেকসময় কণার মতো আচরণকারী।

ইতিমধ্যে আমরা জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তত্ত্ব থেকে জেনেছি যে আলোক তথা ফোটন প্রবাহ মূলত একপ্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ শক্তি(। এতদ্বারা সমস্যার সৃষ্টি হল। আলো কণাধর্মী না তরঙ্গধর্মী তা নির্ধারণ করা নিয়ে।

১৯২৩ সালে আর্থার কম্পটন পরী(া করে দেখলেন যে ইলেকট্রনের মতো ভরবিশিষ্ট কণার সঙ্গে যখন ফোটনের ধাক্কা লাগে তখন ফোটন কণা তরঙ্গের মতো আচরণ করে না। কণার মতো আচরণ করে।

পরমাণুর গঠনে ইলেকট্রন এক উপাদান। ১৯২৩ সালে লুই ভিক্টর পিয়ের রেমণ্ড দ্য ব্রগলি উত্থাপন করলেন ইলেকট্রনের তরঙ্গতত্ত্ব। অর্থাৎ ইলেকট্রন কণা হলেও নিশ্চিতরূপে তার তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে।

তাহলে আরো দেখা গেল কেবলমাত্র আলো নয় অন্যান্য সূক্ষ্মবস্তুকণার বেলায় সূক্ষ্ম বস্তুর এক দ্বৈত ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ কখনো তা কণাধর্মী কখনো তরঙ্গধর্মী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

তাহলে দ্বৈতধর্ম কি সূক্ষ্ম বস্তুর এক বিস্ময়কর চরিত্র যা ক্লাসিকাল ভাবনায় অবাস্তব এবং অসম্ভব? এমনটাই ভেবে নিতে হয় নিরূপায় হয়ে। যদিও তার বাস্তবতা সম্পর্কে আর কোন ধারণা দেওয়া যায় না। সাধারণ জীবনে দৃশ্যমান বস্তুরাশির ে(ত্রে আমরা তার হয় কণাধর্ম নয়তো তরঙ্গধর্ম উপলব্ধি করি। উভয়ের একত্র সন্নিবেশ দেখি না। এমনটা কেন হয়?

১৯২৬ সালে বিজ্ঞানী ওয়ার্নার কার্ল হাইসেনবার্গ প্রস্তাব করলেন অনিশ্চয়তা বা অনির্দেশ্যতার তত্ত্ব (আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল)। এতে বলা হয় – আমরা সূক্ষ্মবস্তুর দুটি যুগ্ম বৈশিষ্ট্য (যেমন ভর ও বেগ) একই সঙ্গে নিখুঁতভাবে মাপতে পারি না। একটি পরিমাপ করতে গেলে অন্যটির পরিমাপ আর ততটা নিখুঁত থাকে না। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তুকণার নিখুঁত পরিমাপ জানা আমাদের প(সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায় বস্তুর সঠিক এবং সর্বাঙ্গীন পরিচয় আমরা সবটা জানি না বা তত্ত্বগতবাবে জানতেও পারিনা।

ঐ সময় বিজ্ঞানী এ(ইন শ্রোয়ডিঙ্গার একটি সূত্র দিলেন, শ্রোয়ডিঙ্গার সূত্র। কণার তরঙ্গ ফাংশন যেন এক বিমূর্ত ব্যাপ্ত অবস্থা। তা জানা থাকলে গণনা করে বলা যায় কোন এক সময়ে কোন এক স্থানে ঐ কণাকে দর্শন করতে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা। অনিশ্চয়তার জন্যে কোন বস্তুকণাকে পাওয়ার সম্ভাবনা ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

কোয়ান্টাম বিদ্যার তত্ত্ব অনুসারে সূক্ষ্মকণার এবম্বিধ দুর্বোধ্যআচরণ নিয়ে আলোচনা হয় ১৯২৭ সালে পঞ্চম সোলভে কংগ্রেসে। সেখানে তাবড় তাবড় অনেক বিজ্ঞানী উপস্থিত হয়েছিলেন। বিবাদমান এক প(অধ্যাপক নীলস বোরের নেতৃত্বে। অন্যপ(অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

ঐ কংগ্রেসে যে ধারণা বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেন তা কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা নামে সুপরিচিত। বলা হয় – ইলেকট্রন ঠিক কি এই প্র(আসলে অর্থহীন। কেননা পদার্থবিদ্যার সাহায্যে তার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আরো বলা হয় যত(ণ কোন বস্তুকে প্রত্য(দেখা হচ্ছে তত(ণই ঐ বস্তুর বাস্তবতা রয়েছে। দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে ঐ বস্তুর আর কোন অস্তিত্ব নেই। তার বাস্তবতা নেই। এখানে চা(ষ দর্শনের কথাই যেন বলা হচ্ছে।

যুরোপে সমসাময়িক কালে উদ্ভূত দৃষ্টবাদী দর্শন (পজিটিভিস্ট ফিলসফি) ঠিক এমনটাই বলতে চেয়েছিল। যাচাই না করে কোন কিছুই মেনে নেওয়া যাবেনা। যাচাই করা মানে দেখা বা দর্শন। যত(ণ দর্শন হচ্ছে তত(ণই বস্তু আছে, তা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু দর্শনের অন্তরালে চলে গেলে সেই বস্তুর আর কোন অস্তিত্ব নেই? এমন করে ভাবতে বসলে বস্তুর অস্তিত্ব একান্ত দ্রষ্টানির্ভর হয়ে যায়। মানুষের কোন অতীত থাকে না। অতীতের বাস্তবতা থাকে না। আমার চারপাশটা থাকে, তার বাইরে কোন শহর থাকে না, দেশ থাকে না। চোখের সামনে যারা আছে, তারাই শুধু আছে। বাইরে আর কোন স্বজন থাকে না, বন্ধু থাকে না। কিংবা ধ(ন, লন্ডন আমি না দেখেও তো লন্ডন আছে, তা মানতে সমস্যা নেই। আমরা কি বলব যে যেহেতু লন্ডন আমার দৃষ্টির বাইরে, সুতরাং লন্ডন বলে কোন শহর নেই। এসব কি করে সম্ভব? আইনস্টাইন বলেছিলেন – তাহলে আকাশে যে চাঁদ আছে তা চোখের আড়ালে থাকলেও তো অবশ্যই আকাশে আছে।

সোলভে সভার পরে আইনস্টাইন-বোরের বিতর্ক খুব জমে ওঠে। আইনস্টাইনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত। ১৯৪৪ সালে (ৃদ্ধ আইস্টাইন ম্যাক্স বর্নকে লেখেন – কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জয়জয়কার ঘটছে বটে তবে এর মধ্যে যে পাশাখেলার দিকটা আছে তা বি(্বাস করা সম্ভব নয়। ঈ(্বর নিশ্চয়ই পাশা খেলতে বসেন নি। বোর চটকদার উত্তরে বলেন – ঈ(্বরকে আর শেখাতে বসবেন না। ঈ(্বরকে না হয় না শেখানো গেল কিন্তু পাশা-খেলার সমস্যার সুরাহা করে উঠতে পারলেন না বোরসাহেব।

ব্যবহারিক প্রয়োগে সূক্ষ্মবস্তুর বেলায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা খুবই সফল তত্ত্ব। এর সাহায্যে রিচার্ড ফাইনম্যান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করেছেন ইলেকট্রনের ভর। ইলেকট্রন মাইক্রো(োস্কোপ নির্মিত হয়েছে। লেজার র(্মির আবিষ্কার এবং অন্যান্য অনেক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু স্থূল বস্তুকণার বেলায় যে বলবিদ্যা কার্যকর এবং যথার্থ বলে মনে হয়, সূক্ষ্ম বস্তুকণার বেলায় তা মনে হয় না কেন? বিপরীতে সূক্ষ্ম বস্তুর বেলায় যে দ্বৈত চরিত্র এবং অনির্দেশ্যতা ল(্য করি তা স্থূল বস্তুর বেলায় ল(্য করি না কেন? এই গু(ত্বপূর্ণ প্র(্নের তাত্ত্বিক মীমাংসা হয়নি এখনো। এবং তা না হওয়া পর্যন্ত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাফল্য সম্পূর্ণ হবে না।

কিছুকাল ধরেই নানা পরী(া নিরী(ায় আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে বিচার হচ্ছে। যেমন, কোন বস্তু আরেকটি বস্তুর পরিপূরক স্থানীয় কিন্তু বিচ্ছিন্ন হলেও বহু দূর থেকে একজন অন্যজনকে প্রভাবিত করতে পারে। আইনস্টাইন বলেছেন — না, তা পারে না। 'অ্যাকশন এ্যাট এ ডিসটান্স' অবাস্তব। বর্তমানে কিছু কিছু পরী(া নিরী(ার বিপরীত ইংগীত পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। আসলে যত(ণ না কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ব্যাখ্যা করছে যে, কি করে সূক্ষ্মবস্তুকণার বেলায় যেরকম আচরণ দেখ যাচ্ছে, স্থূল বস্তুকণার বেলায় তা অন্যরকম হয়, তত(ণ শেষকথা বলা যাবে না।

আপাতত আমরা বলতে পারি – স্থূল বস্তুকণার ব্যাপারে আমাদের সাধারণ ধারণা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। দ্রষ্টার কল্যাণে দ্রষ্টব্য বস্তুর চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় না। সূক্ষ্ম বস্তুকণার (ে(ত্রে এমনটা নাও হতে পারে। সেখানে যুগপৎ দ্বৈত সত্তা বিরাজ করতে পারে। অথবা এমন কোন অজ্ঞাত অবস্থা যার ফলশ্রুতিতে সূক্ষ্মবস্তুর দ্বৈত প্রকাশ সম্ভব। তার নিখুঁত পরিমাপ না হলেও স্থূল পরিমাপ সম্ভব। অন্তিমে প্রকৃত ঘটনা কি প্রকার দাঁড়াচ্ছে তা জানার জন্য কিছুকাল অপে(া করতে হবে।

(গ) অন্তর্জগত

দৃশ্যমান বাহ্যজগত অর্থাৎ বস্তুজগত নিয়ে যদি সূক্ষ্ম স্তরে এত সমস্যা হয় তবে অন্তর্জগত নিয়ে সমস্যা তো আরো গভীর সমস্যাদীর্ণ হবে এ আর বিচিত্র কী! অন্তর্জগত বাহ্যজগতের উপাদানের উপর আসলে এক মানুষী ও প্রাকৃতিক নির্মাণ। ফলে তা বহুলাংশে বাহ্যজগতের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, নির্মাণের জন্যে যে যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় তা হল মানুষের মগজ- ইন্দ্রিয়-স্নায়ুতন্ত্র। অত্যন্ত জটিল যন্ত্র - যার গঠনবিন্যাস কর্মপ্রণালী এখনো বেশির ভাগ অজানা রয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া ব্যক্তি(ভেদে যন্ত্রের জটিলতাও বিভিন্ন প্রকার।

দ্বিতীয়ত, বাহ্যজগত থেকে তথ্য নিয়ে সেই অন্তর্লোক নির্মিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাহ্যজগতই অন্তর্লোকে প্রতিফিলিত হয়। তথ্যসংগ্রহ করা হয় আলো-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি বস্তুজগতের মাধ্যমের মারফৎ। সংগৃহীত তথ্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় করা হয় কথ্য এবং লেখ্য ভাষার মধ্য দিয়ে। সে(ে(ত্রে স্বাধীন নির্মাণের পূর্বে ব্যক্তি(র প্রাথমিক শি(া-দী(ার প্রয়োজন। যেমন ভাষাজ্ঞান ও অর্থবোধ নির্ণয় করা প্রয়োজন। তৎকালীন সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। তারপর স্বাধীন ভাবনা চিন্তা নির্মাণ করতে শেখা প্রয়োজন। সর্বত্র ব্যক্তি(র দ্রষ্টা হিসেবে প্রগাঢ় ভূমিকা আছে। তথ্য সংগ্রহের কাজেও দ্রষ্টার বিশেষতা প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

বাহ্যজগত থেকে তথ্য সংগ্রহের পরে ব্যক্তি(তথা মানবযন্ত্রটি সংগৃহীত তথ্য আবার যন্ত্র থেকেই সংগ্রহ করে তথ্যের পুনর্বিন্যাস করতে পারে অর্থাৎ অন্তর্লোকন (ইনট্রোস্পেকশন) করতে পারে। অন্তর্লোক নির্মাণে মানুষের তথা দ্রষ্টার প্রগাঢ় ভূমিকা অত্যন্ত স্বাভীবিক ঘটনা।

অন্তর্লোকসম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়ে দ্রষ্টার প্রত্য(প্রভাব কিছুদূর অবধি প্রযোজ্য, অন্তত যতদূর পর্যন্ত মানুষ সচেতন এবং আংশিক চেতন (কনসাশ এবং কিছুটা সাবকনসাশ)। অবচেতন ভাবনা প্রত্য(ভাবে দ্রষ্টার দ্বারা নির্ধারিত না হলেও পরো(ভাবে হয়ে থাকে।

সব মিলিয়ে অন্তর্জগতের গঠনে দ্রষ্টার সম্ভ্রান্ত ভূমিকা নিয়ে দ্বিমত পোষণের স্থান

নেই।

৪। মন্তব্য

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে স্থূল বস্তুজগতের দ্রষ্টানিরপে(অস্তিত্ব থাকলেও জ্ঞাত জগত দ্রষ্টানির্ভর থেকে যায়। সূক্ষ্ম বস্তুদগতের বেলায় দ্রষ্টানিরপে(অস্তিত্ব সগৌরবে ঘোষণা করতে দ্বিধা আছে। মানসজগত দ্রষ্টাবির্ভর। বাহ্যজগত বাস্তবে স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমাদের জ্ঞান বাহ্যজগত এবং দেহজ ইন্দ্রিয়-মগজ-স্নায়ুর উপর নির্ভর করে থাকে। তাই বাহ্যজগতের জ্ঞান আমাদের দেখার উপর নির্ভর করে বসে। আমরা যা জানি তা বাহ্যজগত এবং আমাদের জ্ঞানান্বেষণের প্রাথমিক ও পারিপার্শ্বিক নির্বাচনের ফল।

প্র(ো হল - বস্তুজগতের বাস্তবতা এবং আমাদের জাগতিক জ্ঞান এ দুটো কি পৃথক? আমরা কি জগতের প্রকৃত স্বরূপ জানতে অ(ম? এর উত্তরে বলা যায় – আমরা জগতের স্বরূপ অবশ্যই জানতে পারি। জগতকে বহুলাংশে জানিও। তবে সবটা জানি না। অজানা জগত আরো আছে এবং তা উন্মোচিত হচ্ছে। আমরা তা জানতে সচেষ্ট।

কি করে আমরা বস্তুজগতের বাস্তবতায় পৌঁছে যাই? আমরা জগতকে জানতে পারি বস্তুজগতের সঙ্গে নিরন্তর ত্রি(য়াবিত্রি(য়া করে। কর্মের মধ্য দিয়ে। তত্ত্ব রচনা করে এবং তা বাস্তবকর্মে প্রয়োগ করে। যেখানে তা করতে পারি না সেখানে বস্তুর বাস্তবতা বিঘ্নিত হয়। বস্তু আরো বেশী দ্রষ্টানির্ভর হয়ে পড়ে।

জগতে দ্রষ্টা-নির্ভর অস্তিত্ব দ্রষ্টার নির্মাণ। বাহ্যজগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও দ্রষ্টার নির্মাণ, কিন্তু প্রয়োগকর্মের মধ্যে পরী(ত হয়ে দ্রষ্টানিরপে(জ্ঞানলাভে উত্তরণ সম্ভব হয়। বাস্তবতার স্বরূপ সন্ধানে মানবজাতির কাম্য হল নৈর্ব্যক্তি(কদর্শন বা দ্রষ্টা-নিরপে(দর্শন। তার সবটুকু অধিগত হওয়ার সম্ভাবনা যদিও বিরল।

(আমরা সবাই)